এই বইটা সাইফাই-এর

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

প্রান্ত প্রকাশন

উৎসর্গ

তাদের প্রতি, যারা কল্পবিজ্ঞানকে শুধু এলিয়েন,
মহাকাশ আর এআইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি

সম্পাদক জয়ন্তর কথা

Science fiction is the branch of literature that deals with the reaction of human beings to changes in science and technology

- Isaac Asimov

সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞান, সাহিত্যের বিশেষ এক শাখা, যেখানে মানুষের কল্পনার সাথে বিজ্ঞান মিলিত হয়েছে। সায়েন্স ফিকশনের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো হলেও আধুনিক সায়েন্স ফিকশনের শুরুটা হয় শিল্পবিপ্লবের পর থেকে। তবে বাংলায় সাইফাই চর্চা শুরু হয় আরো পরে।

আমাদের ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানের ফেসবুক গ্রুপটিও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানচর্চার অন্যতম প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করছে। গ্রুপের অনেক সদস্যের সাইফাই লেখার প্রতি তীব্র আগ্রহ রয়েছে। গ্রুপটিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাইফাই কনটেস্টের আয়োজন করা হয়। কনটেস্টে বিজয়ী হওয়া গল্পগুলোই স্থান পেয়েছে এই বইয়ে।

বইয়ের গল্পগুলোতে সময়, স্থান, প্রযুক্তি ও মানুষের চিরচেনা ধারণাগুলো নতুন আকার পেয়েছে। কেউ লিখেছেন ভবিষ্যৎ পৃথিবী নিয়ে, তো কেউ বর্তমান সময়ের কোনো ঘটনাকেই কল্পনা আর বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন ঘরানার এই গল্পগুলো আপনার চিন্তার জগতকে আরো প্রসারিত করবে বলে আশা করছি।

তাই আর দেরি না করে কল্পনার জগতে বিজ্ঞানকে আবিষ্কার করার যাত্রা শুরু করুন। আপনার যাত্রা বিজ্ঞান মিশ্রিত কল্পময় হোক।

সম্পাদক আজমাইনের কথা

ছোটবেলা থেকেই সায়েন্স ফিকশন নিয়ে অনেক আগ্রহ ছিল আমার। এই বইয়ে কাজ করার মাধ্যমে অনেক শখ পূরণ হয়ে যায়। ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞানের ফেসবুক গ্রুপের সাথে আমি যুক্ত হই প্রায় ৪ বছর আগে। এর পরের জার্নিটা

অনেক দারুণ ছিল। বিসিবি থেকে প্রকাশিত প্রথম দুইটা বইয়ের সম্পাদনাতেও আমি ছিলাম। এর মাঝে সর্বপ্রথমটা ছিল, "এই বইটা এআইয়ের লেখা" যেটা ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর ঠিক দুই বছর পরে "এই বইটা সাইফাই-এর" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি অনেক নস্টালজিক হয়ে গিয়েছিলাম কাজ করতে গিয়ে। বিসিবির এসব বইয়ের প্রজেক্টগুলোতে কাজ করার অনুভূতি সত্যি দারুণ। বইয়ে অনেকগুলো গল্প রয়েছে, যেগুলো সত্যিকার অর্থে সাইফাই-এর একটা অনন্য দিক তুলে ধরেছে। আশা করি প্রতিটা গল্পই আপনাদের অনেক ভালো লাগবে।

সম্পাদক মনিফের কথা

"ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান" গ্রুপের জাতীয় জাজ হিসেবে এই সংকলনে স্থান পাওয়া অনেক গল্পের বিচারক আমি ছিলাম। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাংলায় যে পরিমাণ বিজ্ঞান কল্পগল্পের চর্চা হয়েছে সেটার নজির অন্য কোথাও বিরল। উৎসর্গে যেমনটা লেখা, যারা কল্পবিজ্ঞানকে শুধু এলিয়েন, মহাকাশ আর এ.আই-এ সীমাবদ্ধ রাখেননি তাদেরকে, এতটুকুই যথেষ্ট বইয়ের সিনোপসিসের জন্য। এখানে স্থান পাওয়া প্রতিটা গল্পই বাক্সের বাইরে যেয়ে চিন্তা করতে পেরেছে। গল্পে বিজ্ঞানের পাশাপাশি ড্রামা, রোমান্স, ক্রাইম ও আরো অন্যান্য সাব-জনরার মিশ্রণে সুস্বাদু ককটেল তৈরি করে এই বইয়ের মলাটের ভেতর পরিবেশন করা হলো।

উপভোগ করুন!

সম্পাদক রুদ্রনীলের কথা

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান গ্রুপে লেখকদের অসংখ্য সাইফাই গল্প আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে, অনেক গল্পই পুরস্কৃত হয়েছে এবং পাঠকের মন জয় করেছে।

এই বইটি সেই সেরা গল্পগুলোর একটি সংকলন। প্রতিটি গল্প আপনাকে সময়, স্থান এবং বাস্তবতার সীমানা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এখানে বিজ্ঞান কেবল ব্যাখ্যার বিষয় নয়, বরং কল্পনার মঞ্চ। তবে বইটির বিশেষত্ব এখানেই নয়।

নতুন লেখকদের জন্য জায়গা করে দেওয়া আমাদের এই উদ্যোগকে আরও অনন্য করেছে। তাদের স্বপ্ন, চিন্তার বৈচিত্র্য এবং কল্পনাশক্তি বইটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

আসুন, কল্পনার সীমানা ছাড়িয়ে বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করি!

সম্পাদক নাঈমের কথা

বিসিবির কল্পবিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হওয়ার ঘটনায় আমি আনন্দে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমার আর কিছুই বলার নেই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গল্প সংকলনে সাহায্যের জন্য রাজেশ মজুমদার ও সুদর্শন পাল ঋককে ধন্যবাদ।

প্রুফরিডার টিমের রাশেদা নাসিরন অহনা, শেখ শান্ত, খবিরুল ইসলাম, ধনঞ্জয় অধিকারী অঙ্গি, শিউলী সুলতানা, শেখ সাব্বির জামান, স্বর্ণজিৎ বালা, তৃষা চক্রবর্তী, মারুক-উল-আলম, নাজমুল হোসেন নাফিজ, তাহফিম হাসান মেহেদী এবং ছহিফা মনির চৌধুরী মমির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের সহযোগিতা বইটির কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে।

সূচিপত্র

১.	**ওয়ার্মথ ইজ দ্যা অনলি ট্রু ফুড**	**১১**
২.	**কলা দানব**	**৩১**
	২.১ দানব নাকি মানব?	৩৩
	২.২ হুতুম প্যাঁচার নকশা তথা ক্যালিবার সময়	৪২
৩.	**ফাংশন কেভ**	**৭৪**
৪.	**ব্রাশ হাতে বাচ্চা**	**৮৭**
	৪.১ প্রজেক্ট এলএলবি	৮৯
৫.	**সিঙ্গুলারিটি**	**৯৪**
৬.	**ইরোটিক মেয়ে**	**১০৯**
	৬.১ রিভাইবা বায়োবট	১১১
৭.	**মাল্টিভার্স ম্যানিপুলেশান**	**১১৬**
৮.	**পাথর**	**১২৫**
	৮.১ পিডি উল্কার	১২৭
৯.	**প্রফেসর জামালের ড্রাইভ মেশিন**	**১৩৪**
১০.	**মিনি সাইফাই**	**১৪৫**
	১০.১ মুক্তির মূল্য একটি হাত মাত্র	১৪৫
	১০.২ সাত দিনের ডোজ	১৪৬
১১.	**জ্ঞানের শেষাংশ**	**১৪৭**
১২.	**আবারও মিনি সাইফাই**	**১৫৩**
	১২.১ মুক্তিযোদ্ধা	১৫৩
	১২.২ পেটেন্ট	১৫৪
১৩.	**সমান্তরাল**	**১৫৬**
১৪.	**প্রফেসর এডারসন**	**১৬৭**
১৫.	**টেকনিক্যাল ফল্ট ইন দ্যা গ্রেট ওয়েদার মেশিন, টোয়াইস**	**১৭২**

১

ওয়ার্মথ ইজ দ্যা অনলি ট্রু ফুড

মনিফ শাহ চৌধুরী

১.

বরফের শ্বেত আবরণের নিচে লুকিয়ে থাকা শতায়ু পেরোনো ভবনটির দেওয়ালে কিছুক্ষণ রড দিয়ে আঘাত করতেই ইট খুলে পড়ল। গাটো তাই কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পরখ করে এরপর হাত দিয়ে একটা একটা করে ইট টেনে খুলে আনতে লাগল।

বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হলো না, অল্প একটু ফাঁকা জায়গা হতেই সুড়ুৎ করে এর মাঝে গলে গেল সে। পেছনে মলিন সূর্য বিরস বদনে বিষণ্ন দিনের দর্শক হয়ে তাই চেয়ে দেখছিল। শত চেষ্টা করেও গাটোর সাথে নিজের রৌদ্রপ্রতাপ ওই ফোকর দিয়ে গলাতে পারল না। তার চাহনি কী ঈষৎ হতাশ ছিল?

শীর্ণ ভবনের ভেতরের অংশ মোটামুটি ঠিকই আছে বলা যায়। যৌবনকালে হয়তো বেশ জমজমাট লাইব্রেরি ছিল, এখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার দিন গুনছে। Down to just bricks and rubble.

দেওয়ালের গা ঘেঁষে সারি সারি করে সাজানো তাকভর্তি বই আর বই। সাহিত্য, ভাষা, প্রাণিজগৎ, ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান আরো খটমটে নানান শ্রেণিতে ভাগ করা হাজার হাজার বই।

গাটোর বই অনেক পছন্দ। বই তার কাছে নতুন জগৎ-এর দুয়ার খুলে দেয় যেন। শীতের রাতগুলোতে যখন গা হিম করা বাতাস শরীরের প্রতিটা ইঞ্চিতে সুচের মতো বিঁধে, গাটো তখন হয়তো তার বইয়ের পাতার কোনো জগৎ-এ মজে রয়েছে, যে জগৎ তারুণ্যে প্লাবী, অরণ্যে ভরপুর, সূর্যের সোনালি উষ্ণতা নীল অম্বর ছুয়ে বিশ্রাম নেয় যে উর্বর-উদার ধরায়।

উষ্ণতা... প্রাণের একমাত্র পরম খাদ্য!

এই উষ্ণতার আশায় ইমিনরা পৃথিবী ছেড়ে উড়াল দিয়েছিল বহু আগেই। বসতি স্থাপন করেছে মরচেরঙা মঙ্গলের বুকে। গাটো তার বাবার কাছে শুনেছে মঙ্গলের বুকে নদী নেই, শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস নেই, কিন্তু উষ্ণতা আছে। গ্রেফ এটার ওপর ভরসা করেই গত কয়েক'শ বছর ধরে একটু একটু করে মানুষদের পাঠানো হচ্ছিল। জাপানিজে ইমিন শব্দের অর্থ দেশান্তরী। প্রসঙ্গক্রমে গ্রহান্তরী অর্থটা বেশ মানায়।

আর তাই বইয়ের ভেতর গাটোর সবচেয়ে পছন্দের হলো মঙ্গল গ্রহ নিয়ে লেখা কল্পবিজ্ঞান, যার মাঝে কিম স্ট্যানলির রেড মার্স সিরিজ তার সর্বাধিক প্রিয়। গত বছর পরিত্যক্ত কারো বাড়িতে ফুয়েল স্ক্যাভেঞ্জ করার সময় পেয়েছিল বইগুলো।

গাটো আর তার পরিবার হলো ফুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার্স। অর্থাৎ, তারা সারাদিন ঘুরে ঘুরে জ্বালানি খুঁজে নিয়ে আসে। বরফের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে মৃত অরণ্য, তা খুঁজে বের করার জন্য চাই শ্যেনচক্ষু এবং বছরের পর বছর ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতা। গাটোর বাবা এ বিষয়ে বেশ পারদর্শী।

একবার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলে সেখানে ছোট একটা পতাকা বসানো হয়। এরপর জোয়ানের দলেরা সারাদিন পরিশ্রম করে জমাট বাধা গাছের ডালপালা উদ্ধার করে। বিশটা ডাল একত্রে বেঁধে প্যাকেট করে রাখে একজন, আরেকজন সেগুলো নিয়ে দূরে সাজিয়ে রাখে। প্রতিটা পরিবারের জন্য একরাতে তিনটা প্যাকেট নির্ধারণ করে দেওয়া। অন্ধকার সম্পূর্ণ গ্রাস করে না ফেলা পর্যন্ত তাদের কাজ আর গান চলতে থাকে। প্রতিবার একই গান অনন্তকাল ধরে পুনরাবৃত্তি করতে থাকে তারা।

"আঁকা আঁকা তো সাইতা হামাবে নো হানা"

সৈকতে পড়ে আছে ফুল, আগুন হয়ে ফুটে আছে যেন

"হি নো হিকারি ও সান সান তো"

সূর্যের কিরণ এত উজ্জ্বল আজ!

"সোরা ইয়ো উমি ইয়ো হানা ইয়ো তাইয়ে ইয়ো"

হে আকাশ, সাগর, ফুল ও সূর্য

“শিমা নো ইনোরি তদোকে”

এই দ্বীপের প্রার্থনার পুনরুত্থান করো!

গানের অর্থ গাটো জানে, কিন্তু সে বোঝে না এই গানটা চলাকালীন কেউ কোনো শব্দ না করে চুপচাপ কেন শুনতে থাকে। সবাইকে দেখে মনে হয় প্রার্থনায় রত, মৃদু ছন্দে কাজ করতে করতেই যেন সবাই দুলছে।

গাটো অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দশটা বই বগলদাবা করল। এগুলো সে তাদের ঘরে নিয়ে যাবে।

২.

গাটো যতক্ষণে ফুজি-সানে (মাউন্ট ফুজি) পৌঁছাল, তখন সূর্যকে আকাশে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, যদিও সন্ধ্যে নামতে এখনও বেশ দেরি। দূর থেকে এই বিশাল পর্বত চিনে নিতে কোনো সমস্যাই হয় না দিনের বেলা। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে পাহাড়ের সামনে বিশাল স্থাপনার জন্য। লম্বা, একরোখা কাঠামোর চূড়া ফুজি-সানের চেয়েও ওপরে। আনুমানিক দেড়শ বছর আগে তৈরি করা হয়, শেষ ইমিনও গ্রহান্তর হওয়ার অনেক আগে। এটার কাজ কী গাটো জানে না, তবে তাদের বুজোকুর (গোষ্ঠীর) সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটা বলেন ইমিনরা এটা আমাদের জন্য বানিয়ে রেখেছে। আমরা যারা রেমুনান্তো আছি তাদের যাতে ভবিষ্যতে উপকার করা যায়, অসহায় হয়ে না পড়তে হয়, তারই আশায় এটা স্থাপন করা হয়েছে। যদিও বাবা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন।

বলাই বাহুল্য, ইমিনদের শেষ স্পেসশিপ আজ থেকে আশি বছর আগেই পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছে। তাদের নিকট ভবিষ্যতে ফেরত আসার সম্ভাবনা একেবারেই নেই, আর প্রতিবছরই আমরা তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। তারা আমাদের সাহায্য কোনোভাবেই করতে পারবে না। বাবা বলেন, যখন চূড়ান্ত মাইগ্রেশনের জন্য সিলেকশন চলছিল, তখন তারা পুরো পৃথিবী থেকে মাত্র আটাশ হাজার দুইশ জনকে বাছাই করে নেয়। এর ফলে পুরো পৃথিবীতে মরে যাওয়ার জন্য ফেলে যাওয়া আশি লক্ষ মানুষ তীব্র প্রতিবাদ করে। আন্দোলন

যত তীব্র হয়, উগ্রতা তত বৃদ্ধি পায়। ইমিনরা যাদের মাইগ্রেশনের জন্য নির্বাচিত করেছিল, তাদের ওপর সাধারণ মানুষ, মানে অবশিষ্টরা আক্রমণ করেছিল। ইমিনদের স্পেসশিপেও বোমা ফেলা হয়। মানুষের আক্রোশ, মৃত্যুভয় সবকিছুর বিস্ফোরণ হয়েছিল সে সময়।

তাই পরিস্থিতি ঠান্ডা করতেই ইমিনদের আন্তর্জাতিক সংস্থা, ইউএন পুরো বিশ্বে আগ্নেয়গিরির কাছে, যেখানে মানুষেরা উষ্ণতার আশায় বসতি গেড়েছিল, সেখানে বিশাল বড় বড় কাঠামো নির্মাণ করে দিয়ে যায়। এই স্তম্ভগুলো ভবিষ্যতে আশি লক্ষ মানুষের শক্তি চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এমন আশ্বাস দিয়েছিল তারা। তাদের বিশ্বজুড়ে এই বিশাল প্রজেক্টের কার্যতৎপরতা দেখে তখনকার সময়ের সাধারণ মানুষ একটু শান্ত হয়েছিল।

তবে বাবার মতে পুরো ব্যাপারটাই একধরনের ধোঁকাবাজি ছিল। আন্দোলন থামানোর একটা কৌশল মাত্র। নইলে গত দেড়শ বছরে বা আশি বছরে এই স্তম্ভ বা কাঠামোগুলো দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না কেন? এগুলো কীভাবে শক্তির চাহিদা পূরণ করবে, তা কেউ জানে না। যারা জানত, তারা হয়তো বহু আগেই মারা গেছে বা আশি বছর আগে মাইগ্রেশনের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। যারা এসবের কার্যপদ্ধতি জানে, তারা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান। তাই তাদের মঙ্গলে নেওয়া হবে এই স্বাভাবিক ছিল। শুধু গণ্ডমুর্খের দলদের, তাদের মতে, পৃথিবী নামের এই বরফের গোলকের ওপর মরে যাওয়ার জন্য ফেলে যাওয়া হয়েছে। বাবা ওদের ‘ককুযাকু ইমিন’ বলেন। অর্থাৎ, বেইমান গ্রহান্তরীর দল।

আর আমরা, রেমুনান্তো। ফেলনা, অবশিষ্ট।

-“কীরে, এত দেরি করলি কেন? কোথায় ছিলি?”

-“মা, ওইদিকের পুকুরের পাশে একটা বিশাল বড় দালান আবিষ্কার করেছি। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না মা! ওটা একটা আস্ত লাইব্রেরি!” গাটোর চোখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে।

গাটোর মায়ের মুখেও হাসির ঝিলিক দেখা যায়। “আচ্ছা তোর বাবাকে জানাস, কাল স্ক্যাভেঞ্জারদের পাঠানো যাবে।” বলেই মা একটু কাশলেন। “নতুন বই এনেছিস, আগেরগুলো পড়া হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে দিস।”

-"আচ্ছা মা। তুমি মধু খেয়েছিলে? কাশ বাড়ছে মনে হয়?"

-"খাচ্ছি, চিন্তা করিস না। তুই দেরি করিস না, অন্ধকার হয়ে এলো। আগুন জ্বাল তাড়াতাড়ি। মাছগুলোও বসিয়ে দে, যা!"

গাটো সুবোধ বালকের মতো কাঠ একট্টা করে আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর আজ পুকুর থেকে ধরা মাছ বসিয়ে দিল। অবশ্য আগে মশলা মাখিয়ে নিতে ভুলল না। ফুজি-সানের পাদদেশে খনন করে একটা পুকুর বানানো আছে যার ওপরের অংশ সবসময় বরফ হয়ে থাকে। তবে একটু পুরু বরফ ইনসুলেটরের মতো কাজ করে, পুকুরের তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। পুকুরের তলদেশ নিকষকালো আঁধারে ঘেরা, ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে গেলেও সুবিধা করা যায় না। গাটো জানে কারণ গতবার একটা ছেলে পানিতে পড়ে গেলে উদ্ধারকাজে সেও অংশ নিয়েছিল।

পুকুরের নিচেই রয়েছে ফুটন্ত লাভা! সেই লাভার কারণে তৈরি হয়েছে কিছু হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট, যেগুলোর উষ্ণতা আর কেমিক্যাল স্যুপ খেয়ে ঘন হচ্ছে এলগি আর ব্যাকটেরিয়ার দল। সাথে আছে ছোট চিংড়ি, পাবদা আর পাঙাসের সাম্রাজ্য। অত্যাধিক ঠান্ডার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বিবর্তনের ফলে এখন এদের শরীরে অতিরিক্ত চর্বি আর তেল। এরকম আরো বিশটা পুকুর আছে তাদের, পুরো গোষ্ঠী পুরোপুরি মাছের ওপর নির্ভরশীল।

তবে মাঝে মাঝে ভাগ্য প্রসন্ন হলে তারা শ্বেত ভাল্লুক শিকারের অনুমতি পেয়ে যায়। এসব ভাল্লুকেরা বরফের আচ্ছাদন ভেঙে পুকুরে ডুব দিয়ে ছ'ইঞ্চি ধারাল নখের মাঝে মাছ বিঁধে ওপরে উঠে আসার সময় গা টানটান করে প্রস্তুত থাকে বর্শাবাজের দল। ভাল্লুকের মুখ পানির ওপরে বের করার সাথে সাথে এফোঁড় ওফোঁড় করে বেড়িয়ে যায় চকচকে ফলা যা ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে লোহিত বর্ণ ধারণ করার আগেই জমে যায় রক্তের ধারা।

সে রাতে ভোজ অনুষ্ঠান হয়, গাটোর খুব ভালো লাগে!

৩.

নিজের ঘরে এসে বইগুলো একপাশে সাজিয়ে রাখল গাটো। তার ঘরের দেওয়াল পুরোটাই বিভিন্ন সংখ্যা, চিহ্ন দিয়ে ভর্তি। কাছে থেকে দেখলে বোঝা

যায় এগুলো অসংখ্য অমীমাংসিত সমীকরণের ছড়াছড়ি। গাটোর বই পড়ার পাশাপাশি আরেকটা শখ হলো তাপ থেকে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা। সমস্যা বাধে সার্কিটে। সার্কিটের তারের মাঝে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলে ভেতরের এটম বা অণুগুলো বেশি ভাইব্রেশন করে, যার ফলে ফ্রি ইলেকট্রনের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, তাপমাত্রা বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়, ইলেকট্রিসিটি কমে যায়।

সেই তাপ যদি হাজারখানেক সেলসিয়াস হয়? তাহলে সার্কিটই পুড়ে যাবে, কারণ এত তাপে ভেতরের কপারের তার অনেক আগেই গলে যাবে। আর যদি এমন কিছু দিয়ে তার বানানো হয়, যার থার্মাল স্ট্যাবিলিটি বেশি, তারপরেও এরা এত নাচানাচি করবে যে, ইলেকট্রন আর সার্কিট ঘুরে আসতেই পারবে না। ইফিশিয়েন্সি শূন্যতে নেমে আসবে!

অথচ এখন এই উচ্চ তাপই ভরসা। ফুজি-সানের নিচে পাথর গলানো সমুদ্র রয়েছে, হাজারখানেক সেলসিয়াস তাপমাত্রার ম্যাগমা থাকতে তার গোষ্ঠীকে এনার্জি ক্রাইসিসে ভুগতে হচ্ছে? কোনো না কোনো উপায় তো আছেই!

তাপ বলতে বোঝাই অণুদের ছোটাছুটি, তাদের কাইনেটিক এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জিকে ব্যবহার করা এত কঠিন কেন লাগছে তাদের কাছে? ইমিনরা সব নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন থেকে আর পৃথিবীর গর্ভ থেকে সব ইউরেনিয়াম শুষে না নিয়ে অন্তত কিছু রেখে যেতে পারত!

গাটোর মাথায় সোলার প্যানেল ঘোরে। টেলুরিয়ামের এক কমপাউন্ডের তৈরি সোলার প্যানেলগুলো সরাসরি সূর্যের আলো থেকে পাওয়া এনার্জি দিয়ে একটা ইলেকট্রনকে ধাক্কা মেরে সার্কিটে চলাতে বাধ্য করতে পারে। আর এখানে এটমের কিছু হয় না, তার ভাইব্রেশনও তেমন বাড়ে না। কিন্তু সূর্য থেকে ৬ অ্যাস্ট্রোনোমিকাল ইউনিট দূরত্বে সোলার প্যানেল সামান্য ফ্ল্যাশলাইট চার্জ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে আসে না। অথচ ক্রমশই এ দূরত্ব বেড়েই চলছে। পৃথিবী এখন আকাশগঙ্গায় ছুটে চলা গন্তব্যহীন ভবঘুরে এক গ্রহ!

(গাটোর দৈনন্দিন জীবনের গল্প শোনার এই পর্যায়ে দৃশ্যপট হুট করে বদলে যাবে। গাটোর ঘর থেকে দৃশ্যটা উপরে উঠতে থাকবে এবং একপর্যায়ে মাউন্ট

ফুজির চেয়েও অনেক উপরে উঠে যাবে। উপর থেকে যখন সবকিছু ক্ষুদ্র, নগণ্য লাগবে, ঠিক তখনই এই স্থানের সময় বদলে যাবে এবং আমরা দেড়শ বছর আগের দৃশ্য অবলোকন করব।)

দেড়শ বছর আগে

মাউন্ট ফুজির কাছে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। সূর্য থেকে পৃথিবী মাত্র ১.৫ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরে কী সরে গেছে আর গড় তাপমাত্রা হুট করে ১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে! শীতে কাপতে কাপতেই প্রজেক্ট সানরাইজ এর তদারকি করছিলেন নাতিশীতোষ্ণ দেশ থেকে আসা উষ্ণপ্রিয় মেজর সালমান হক।

মাউন্ট ফুজি জাপানের সবচেয়ে উঁচু পর্বত এবং একটি আদর্শ আগ্নেয়গিরি। স্থানীয়রা একে ডাকে ফুজি-সান বলে, অনেকটা মানুষের নামের শুরুতে মিস্টার সম্বোধনের মতো।

জাপানিদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন সালমান। এরা বেশ কর্মঠ, সৎ ও আশাবাদী হয়ে থাকে, যার প্রমাণ হলো পর্বতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল স্তম্ভের অবকাঠামো। এত দ্রুত পৃথিবীর আর কোথাও কাজ এগোয়নি।

-"স্যার", এলোকেশী এক সৈনিক এসে সটান স্যালুট মেরে বলল, "হেডকোয়ার্টার কলড ফর আ মিটিং। দে আর ওয়েটিং অ্যাট ইয়োর পার্সোনাল লাইন, স্যার।"

ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে তার নিতম্বের দুলুনির দিকে চেয়ে মিটিং-এ কী বলতে হবে তা ঠিক করে নিলেন মেজর হক। দীর্ঘ ২০ বছরের মিলিটারির জীবনের প্রমাণ লেপ্টে থাকা অনুভূতিশূন্য চেহারা নিয়ে হাঁটা দিলেন তার চেম্বারে।

-"মেজর হক, আমরা আবারও জানতে চাচ্ছি ঠিক কীভাবে বিক্ষোভকারীরা আপনার তত্ত্বাবধায়নে থাকা প্রজেক্ট সানরাইজের নির্মাণ স্থানে ঢুকে গন্ডগোল বাঁধাল?"

মেজর হক মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মিটিংয়ের বিশ মিনিট ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে, সেদিনের ঘটনা পুরোটা ব্রিফও করেছেন তিনি, অথচ এই একই প্রশ্ন এই নিয়ে তিনবার করল তারা। প্রজেক্টের বোর্ড অফ কমিটি।

-"আপনারা যদি সিসি ফুটেজ লক্ষ করেন, আপনারা দেখবেন কোথাও তাদের আনাগোনা চোখে পড়বে না। সি-জোনের ভিত্তির কাছে ব্লাস্ট হওয়ার পর সবাই সতর্ক হয় এবং তখন অনেককে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। আমার সৈনিকরা তাদের ওপর ফায়ার করলে তাদের অনেকে মারা পরে আর বাকিদের আমরা গ্রেফতার করেছি", একটু থেমে আবার শুরু করেন সালমান, "আমার মনে হয় তারা খুব ভালো করেই জানত পুরো সাইটের কোথায় কী রাখা, এবং সিসি ক্যামেরাগুলোর রেঞ্জ কতটুকু। সবকিছু একটা ব্যাপারেই ইঙ্গিত করে যে, ভেতর থেকে তাদের কেউ সাহায্য করেছে।" মেজর থামলেন।

-"আপনার সৈনিকদের ভেতর কাউকে সন্দেহ করেন, মেজর?"

-"ওয়েল, স্যার, প্রজেক্টে শুধু আমার সৈনিকরাই নেই। কিছু বিজ্ঞানী, মেকানিক, কর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারও কিন্তু রয়েছে।"

-"কিন্তু শুধুমাত্র আপনার সৈনিকরাই পুরো সাইটে অবাধে চলাফেরা করতে পারে মেজর। বাকিদের সে সুযোগ বা অনুমতি কোনোটাই নেই।"

-"রাইট, স্যার।" মেজর চুপ করে রইলেন।

-"আপনি হয়তো ব্যাপারটার গুরুত্ব ভুলে যাচ্ছেন মেজর। পুরো পৃথিবীতে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। আজ সকালে যেই মাইগ্রেশন শিপের ৫০২ জন মানুষ নিয়ে মঙ্গলে রওনা হওয়ার কথা ছিল তা এই উগ্রপন্থির দল গত মাসে বোমা মেরে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। এর ওপর যদি আপনার নাকের ডগা থেকে কনসেন্ট্রেটেড টেলুরাইড সেল চুরি হয়ে যায়, তাহলে তো সমস্যা। সাধারণ মানুষদের জন্য আমাদের যে প্রজেক্ট সানরাইজ তার ক্ষতি করার জন্য আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, মেজর। পুরো পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানেরা জবাবদিহিতা চায়, একটা চেহারা চায়। আপনি বুঝতে পেরেছেন?"

-"জি, স্যার।"

-"তাহলে আবার প্রশ্ন করি, মেজর। আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?"

-"একটা মেয়ে সৈনিকের আচরণ আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়", মেজর হক শান্ত দৃষ্টিতে বোর্ড অফ কমিটির দিকে চেয়ে বললেন, "এলোকেশী, এস-৩৬৫।"